বাংলার দীঘি, খাল-বিল ও লোকসংস্কৃতি

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় জলেরপ্রয়োজন হয়। জলের অপর নামজীবন। নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দীঘিপ্রভৃতি জলাশয়ের নিকটবর্তী বাঙালী বাস করতে চায়। জলাশয় বাঙালীর প্রয়োজন হয়জন্মের আগে থেকে এবং মৃত্যুর পরেও। জলাশয় চাই পূজা-পার্বণে এবং বিভিন্ন উৎসবে। অনেক হাট এবং মেলা বসে নদীর ধারে। বিশেষ দিনে অনেক বাঙালী নদীতে স্নান করে। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে জলওতপ্রোতভাবে জড়িত । নদীতীরেঅধিকাংশ গ্রামেরই পত্তন হয়েছে। গ্রামবাংলার জলের প্রয়োজন হয় ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক এবংবিনোদমূলক (ceremonial and recreational) উৎসবে ।

গ্রামবাংলার অধিকাংশ মানুষকৃষিজীবি। কৃষিকার্যের ওপরনির্ভর করে বেঁচে থাকে। কৃষিকার্যের জন্য জলের প্রয়োজন হয়। জল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জল শব্দ বাঙালীরা ব্যবহার করে। বাঙালীর ঘরে জল নিয়ে হয় বিবাহা দিতেসংস্কার বিশেষ (মঙ্গলাচরণ করা)। প্রতিবেশীর গৃহ থেকে 'জলসওয়া'(জলসংগ্রহ), শান্তিনিমিত্ত মন্ত্রপূত জল যাহা পূজার পরে ভক্তদের কল্যাণ কামনায় তাহাদের মাথায়ছিটানো হয়, তার নাম 'শান্তি জল'। জলসত্র, জলখাবার প্রভৃতি ন নাভাবে বাঙালী জলের উল্লেখকরে। কিন্তু 'পানিফল'(জলজ ফলের চাষ করে)। পানি শব্দটি (হিন্দী)।

বাঙালী মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ করে,গান করে বা করিয়ে, শুনে এবং শুনিয়ে আনন্দলাভ করতো। বাঙালী পাল ও সেন আমলে দূরদেশে দেশান্তরে নদীপথে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতো। পরে তা লুপ্ত হয়। সমুদ্রযাত্রা শুধু মনস ামঙ্গল কাব্যে শোনা যেত।

বাঙালী জাতি প্রসঙ্গে আচার্যসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

'..."বাঙ্গালী জাতি" বলিলে, যে জন-সমষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃবাষারূপে বা ঘরোয়া ভাষারূপে ব্যবহার করে, সেই জন-সমষ্টিকে বুঝি। বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টিরমধ্যে দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষজীবন-যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগেরভারতের ভাব-ধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যেবাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা-ই "বাঙ্গালীসংস্কৃতি"। এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি-কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে-সকল কাব্যেকবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা-ই "বাঙ্গালাসাহিত্য"।......

নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত)স্বদেশী ভাষা প্রসঙ্গে লেখায় জলের কথা উল্লেখ করেন ঃ

"নানানদেশের নানান ভাষা /বিনে স্বদেশীয়ভাষা পুরে কি আশা।/ কত নদী সহোবর কিবা ফল চাতকীর/ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।'

পরাধীন ভারতের মুক্তির গানেস্বাধীনতাকে দুখ-সাগর-এর সঙ্গে তুলনা করেন কবি গোবিন্দ চন্দ্র রায় ঃ

'কত কাল পরে, বলভারতরে,
দুখ—সাগরসাঁতারি পার হবে।'

লোকজীবনেনদ-নদীর প্রভাব ঃ

অনেক বাঙালী ছেলে-মেয়ের নাম রাখেনদ-নদীর নামে । যেমন ঃ গঙ্গা, পদ্মা,যমুনা, অজয়, দামোদর প্রমুখ।

নদ-নদীএবং বিভিন্ন জলাশয় থেকে গ্রাম নামঃ

পশ্চিম বাংলায় যে সব নীচু জমিবর্ষায় প্লাবিত হয় ও জল নেমে গেলে ভাল ফসল ফলায় তার নাম'ডহর'। এই থেকে গ্রামেরনাম হয়েছে ঃ ডহরকুণ্ডু (আরামবাগ থানা,), ডহরলঙ্গি (হবিবপুর,মালদহ)। এই রকম'ডহর' নিয়ে আরও অনেক গ্রামের নাম শোনা যায়।

বিস্তৃত জলাভূমিকে 'বিল'বলা হয়। 'বিল' নিয়ে অনেকগ্রামের নাম শোনা যায়। যেমনঃ বিলবাড়ি (নবগ্রাম, মুর্শিবাদ),বিলদহ(হরিশচন্দ্রপুর, মালদহ) বিলজিয়ালা (তেহট্ট, নদীয়া) বিলমাধিয়া (মোহনপুর, মেদিনীপুর), বিল ভেলি(বারাসত,২৪পরগনা), বিলকাঁদি (নলহাটি, বীরভূম),বিলতোড়া(রঘুনাথপুর, পুলিয়া) ইত্যাদি।

প্রবাহহীন মজা খাল,শাখানদী'কাঁদর' নামে পরিচিত। অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে কাঁদর যুক্ত হয়েছে, যেমনঃ কুসুমাকাঁদর(মহম্মদ বাজার, বীরভূম), খোচা কাঁদর (হবিবপুর, মালদহ)প্রভৃতি।

জলের বিভিন্ন রূপ জলা, ঝরণা,ঝোরা প্রভৃতি। শিলিগুড়ি-দার্জিলিং পার্বত্য পথের পাশে 'পাগলাঝোরা'র কথা অনেকের মনে পড়বে। 'ডোবা' ছোট জলাশয়। মহিষ ডোবা (শালবনী, মেদিনীপুর), শিঙাডুবা(বিনপুর, মেদিনীপুর),হাতিডুবা (কোচবিহার),চৈতন্যডোবা (হালিশহর বা কুমারহট্ট, ২৪-পরগণা) দহ (অগাধ জল)। কালীদহ (রামপুরহাট,বীরভূম) প্রভৃতি। দীঘি থেকে নাম হয়েছে ঃ সাগর দীঘি (মুর্শিদাবাদ), টানাদীঘি(জয়পুর,বাঁকুড়া)।

দীঘি বা পুকুর কাটানো এককালেশুধু জনহিতকর কাজই ছিল না, মহাপুণ্যকর্ম বলেও বিবেচিত হতো। দীঘি থেকে গ্রামের নাম হয়েছে —রায়দীঘি (২৪ পরগনা), মহাপালদীঘি(কুশমণ্ডি, পশ্চিমদিনাজপুর)। তা'ছাড়া অনেকগ্রামের নাম নালা ও পুকুর প্রভৃতিনিয়ে।

হেটোছড়ায় ইতিহাসের উপাদান ঃ

কলকাতা শহর গড়ে ওঠার সময়থেকে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের মৎস্য-শিকারী সম্প্রদায়, কৈবর্ত অর্থাৎ ধীবর বা জেলেরা এখানে বাস করতে শু করেন। সেকালে কলকাতায় অসংখ্য পুকুর-ডোবা-খাল ছিল। কলকাতার পূর্ব দিকে প্রকাণ্ড বাদাঅঞ্চলে পাওয়া যেত প্রচুর মাছ। তা'ছাড়া জেলেরা গঙ্গায় জাল ফেলে,ছোট ডিঙ্গির সাহায্যে ধরতো অনেক মাছ।

সেকালে কলকাতায় একটি খাল বা ক্রীক ছিল। সেই খাল থেকে এই রাস্তার নাম'ক্রীক রো' হয়েছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্ব হতে আরম্ভহয়ে এই রাস্তাপূর্ব দিকে সার্কুলার রোড পর্যন্ত গিয়েছে। পূর্বে একটি খাল, ক্রীক রো , ওয়েলিংটন স্কোয়ার, বেন্টিংস্ট্রীট, হেয়ার স্ট্রীট প্রভৃতি স্থান দিয়ে গঙ্গায়পড়িত। একটি হেটোছড়ায় পাওয়াযায় এই রাস্তায় উল্লেখ পাওয়া যায় ইতিহাসের উপাদান। ছড়াটির নামঃ ধীবরের পাঁচালি। ছড়াটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

ধীবরেরপাঁচালি

'বহুগ্রামেবহুবার অন্নকষ্ট হয়।
বহুজনগ্রাম ছাড়ে কত ভয় ভয়।।
চোখে পড়ে চারিদিকে মাঠে নেই ধান।
হায়হায় করে সব উড়ে যায় প্রাণ।।
বৃষ্টিবিনে চাষ যায় শুষ্ক কৃষিজাত।
চাষীকাঁদে অনাহারে কাঁদে দিনরাত।।
অন্নাভাবদেখে যারা পথ খোঁজে ভিন্ন।
ধীবরেরজন্য জলে প্রাপ্য খাদ্য চিহ্ন।।
মাটিছাড়া খাদ্যপ্রাপ্তি নদীনালা খালে।
মাছছাড়ে বড় করে তবু কষ্ট ভালে।।
সারারাত জলে ডুবে মাছ ধরে আনে।
খেতেদেয় কত মাছ বেঁচে থাকা জানে।।
জেলেজাতি স্থিরমতি নদী-খালে কাজ।

জাল ফেলে কষ্ট করে ধরে আনে মাছ।।
জলচাই বৃষ্টি চাই চাই খাল বিল।
চাইনদী নলাডোবা চাই বড় ঝিল।।
খালছিল গল্প শুনি জেলেপাড়া পাশে।
ত্রীকরো-যে নাম তার লেখা ইতিহাসে।।'

আর একটি হেটো ছড়ায় উল্লেখকরা হয়েছিল, শহর বাড়ছে, জলা, ডোবা প্রভৃতি বুজিয়ে ঘর-বাড়িউঠছে। কিন্তু যদি আগুন লাগে তখননিবিয়ে ফেলার জন্য জল কোথা থেকে সংগ্রহ করবে ! ছড়ার কিছু অংশ হলো এই ঃ

পুকুর- ডোবা ফেলছে ছেঁচে
'কলিকাতারবাড়ছে সীমা ধানের জমি হারায় কত।
শহরছোটে এলাকা বাড়ে দ্রৌপদীর শাড়ীর মত।।
পুকুরডোবা ফেলছে ছেঁচে উঠছে বাড়ি শহর বাড়ে।
গরিবজনে খেদায় কত পাঠায় দেখি পগার পাড়ে।।
আগুনএসে ধরলে ছুটে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে।
কাঁদরছেঁচে ঘর উঠেছে চোখের জল ফেলবে সবে।।'

আহিরীটোলারগঙ্গাবন্দনাঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবেরপূর্বেই কলকাতার আহিরীটোলার পল্লীবাসীরা 'গঙ্গাবন্দনা'র অঙ্গহিসাবে 'বন্দোমাতা সুরধবনি' গানটি গাইতো এবং সেই সঙ্গে একটিমিছিলও বের করত।

বাঁকুড়ারতুষু এবং ভাদু গানে নদ-নদী প্রসঙ্গ ঃ

বাঁকুড়ার একটি তুষলা গানেশোনা যায় নদী এবং ভেলার উল্লেখ। তুষলা গানের কিছু অংশ হলো এই ঃ

'সংক্রান্তিরনিশি শেষে মকর আসিবে নিতে গো,
ভেলায় চড়ে মোদের তুষলা কোন সুদূরেযাবে গো।
এক মাস রাখিলাম মাকেবাঁশের বেড়া ঘরে গো,
আর রাখিতে পারিবনামা তোমারে গো।
চূড়া দেওয়া ভেলাতোমার ভাসিয়ে দিব জলে,
তার পরে মকর জলেডুব দিব মোরা সকলে।'

আর একটি বাঁকুড়ার তুষু গানেবলা হয়েছে জলে কথা ঃ

'জলে হেলা জলে খেলা জলেতুমার কে আছে,
লক্ষ্য করে দেখতুষু জলে তুমার ঘর আছে,

বাঁকুড়ার একটি ভাদুগানেরআসরে সরস্বতী বন্দনায় শোনা যায়, সংসাররূপী নদ এবং তরীর উল্লেখ। ভাদুগানের কিছু অংশ হলো এই ঃ

'নমি শ্বেতাম্বরি।
মম কণ্ঠে বসগো কৃপা করি।।
সজ্ঞানে আমি তব পদে গো,স্মরণ করি।
সংসারে অতলনদে,কূলেতে মোর ঠেকাও তরী।।'

পটুয়ারগানে জলাশয় ঃ

ঝাড়গ্রামের একটি পটুয়ার গানেওপাওয়া যায় জলাশয়ের কথা। কিছু অংশহলো এই ঃ

'যে গ্রামে ডাক্তারবৈদ্য যদি গী হয়,
সেই গ্রামে আর থাকানিরাপদ নয়।
যে গ্রামের মেয়েদেরসন্তানে নেই মায়া,
সেই গ্রামের মেয়েদেরমাড়িওনা ছায়া।
যে গ্রামে নেইকো দীঘিনেইকো জলাশয়,
সে গ্রামে দিওনা মেয়ে শুনমহাশয়।
যে গ্রামে তাঁতী কামারকুমোর ছুতোর ঘর,
সে গ্রাম ভাল সকলে করেতার আদর।
গ্রামের পাঠশালার খড়যে গ্রামে কিনতে হয়,
সে গ্রাম ভাল নয় জানিবে নিশ্চয়।
যে দেশে পুলিশ সৈন্য করে ভয় ভয়,
সেদেশের মঙ্গল কখনো না হয় '।

চৈতন্যডোবা প্রসঙ্গ ঃ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানেচোখে পড়ে অনেক লৌকিক দেব-দেবীর থান। অধিকাংশ লৌকিকদেব-দেবীর থানের পাশে ডোবা বা পুকুর চোখে পড়ে। ওই সব পুকুর-ডোবানিয়ে শোনা যায় অনেক লোককাহিনী। হালিশহরে বৈষ্ণবতীর্থ চৈতন্য ডোবা। এই প্রসঙ্গে গুপদ দাস বাবাজী লিখেছেনঃ

'যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে।।
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীরজন্মস্থান।।
প্রভু বলেন এই কুমার হট্টরনমস্কার।
ঈশ্বরপুরীর যে গ্রামেঅবতার।।
কান্দিলেন বিস্তর,শ্রীচৈতন্য সেই স্থানে।
আর কিছু শব্দ নাইঈশ্বরপুরী বিনে।।
সে স্থানের মৃত্তিকাআপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বাঁধিএক ঝুলি।।
প্রভু বলেন,ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন-ধন-প্রাণ।।'

শ্রীচৈতন্যদেবের লক্ষ লক্ষভক্ত উক্ত স্থান থেকে মৃত্তিকা গ্রহণের ফলে একটি ক্ষুদ্র ডোবায় সৃষ্টিহয়। অদ্যাপি শ্রী শ্রীচৈতন্যডোবা' নামে বিরাজিত।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেনঃ 'কুমার হট্টের কতকগুলি ধূলি তিনিকোঁচার খুঁটে বাঁধিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ঈশ্বর পুরীরজন্মস্থান, এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ"........'

জীয়ৎকুণ্ডেশ্বরীও জীয়ৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে লোক কাহিনীঃ

মুর্শিদাবাদ জেলার সামসের গঞ্জ থালাএলাকা নামকরা জায়গা। এই থানায়গ্রামদেবী জীয়ৎকুণ্ডেশ্বরী নিয়ে বহু কিংবদন্তী আজও গ্রামবাসীর মুখে মুখেঘুরেছে। গ্রামদেবীর থানের পাশে একটিপুকুর রয়েছে। জনৈক গ্রামবাসী

বলেন,এই পুকুর প্রাচীন ‘জীয়ৎকুণ্ড’।

ভাদুলীব্রতের ছড়া ঃ

‘এ নদী সে নদী একখানেমুখ/ভাদুলী ঠাকুরাণী ঘুচাবেন দুখ’/এ নদী সে নদী একখানেসুখ/দিবেন ভাদুলী তিনকুলে সুখ...

বন্দিনীগঙ্গা ঃ

গঙ্গা পবিত্র নদী। হিমালয় পর্বত থেকে বাংলায় পলিমাটি বয়েনিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। বাংলা সুজলা,সুফলা, শস্যশ্যামলা হবার অনেকগুলিকারণের মধ্যে হলো গঙ্গানদীর দান। গঙ্গারঅনেক নাম। ভাগরথী, জাহ্বী,সুরধুনী,হুগলী নদী প্রভৃতি নামে পরিচিত। কিন্তু মজিলপুর-জয়নগরে আর একটি নাম শুনেছিলাম। স্থানীয় কয়েকজন বলেন, বন্দিনী গঙ্গা। অর্থাৎস্থানীয় দীঘি-পুষ্করিণীর আর একটি নাম। স্রোতস্বিনী গঙ্গার মতো স্থানীয় দীঘির জল পবিত্র। এই ধারণা ও লোক বিশ্বাস বহুদিনের। দীঘির জল কলসি করে অনেকে দেব-দেবীরমন্দিরে নিয়ে যায়। নিত্য পূজা ও বিশেষপূজা-পার্বণে দীঘির জল ব্যবহার করা হয়। প্রায় সর্বত্র নদীর ধারে বসে পিতৃলোকের আত্মার শান্তিকামনা করতে দেখা যায়। শারদীয়দুর্গাপূজার পূর্ব অমাবস্যা মহালয়া নামেপরিচিত। এই দিনে অনেকে পিতৃকার্যকরেন। অর্থাৎ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণনাদি কর্ম সম্পাদনের রীতিনীতিপ্রচলিত। গঙ্গানদী কূলতর্পণাদি কার্যের পবিত্র স্থান। বন্দিনী গঙ্গার পাড়েও ঐ রূপপিতৃকার্য হয়ে থাকে। অনেকের বিশ্বাস ,স্রোতস্বিনী গঙ্গা ও বন্দিনী গঙ্গার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন ঃ ‘গ্রাম মজিলপুর। কলিকাতা শহরের প্রায় ত্রিশমাইলদক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে মজিলপুর নামেএকটি গ্রাম আছে। ইহা প্রসিদ্ধজয়নগর গ্রামের পূর্বপার্শ্বে অবস্থিত।...

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

‘... গ্রামখানির ইতিবৃত্ত জানিনা, অনুমান করি, এককালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছিল এবং গ্রামখানি গঙ্গার চড়ারউপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।(এখনো মজিলপুর ও জয়নগর এইউভয় গ্রামের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডকে “গঙ্গারবাদা” বলেএবং এখনো আমাদের গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণীর জল পবিত্র গঙ্গাজল বলিয়া গণ্য হয়)...’

কয়েক বছর আগে স্থানীয় জনৈকপল্লীবাসীর কাছ থেকে একটি ছড়া সংগ্রহ করেছিলাম। ওই ছড়ায় স্থানীয় দীঘিকে ‘বন্দিনী গঙ্গা’ বলা হয়েছে।

ছড়াটি হল এই ঃ

‘পুণ্যভূমিমজিলপুর-্জয়নগর।
ধন্য তারা যারা হেথাবেঁধে ছিল ঘর।।
গঙ্গাবাদা ঝোপ-ঝাড় পবিত্র অঞ্চল।
মাটির তলেতে হেথাআছে গঙ্গাজল।।
ডোবা দীঘি পুষ্করিণীযত দেখা যায়।
বন্দিনী জাহ্বী গঙ্গা নামেপূজা পায়।।
বড়গঙ্গা, কাটাগঙ্গাগঙ্গাসুরধুনী।
দীঘি গঙ্গা-বারি করেমুক্ত প্রেতযোনি।।

হেটোছড়ায় বন্যা ঃ

একসময় দেশের যেকোন অঞ্চলে কিছুঘটলে, সেই বিষয় নিয়ে ‘হেটোবই-হেটোছড়া’ বের হতো। প্রাকৃতিক দূর্বিপাক ঘটলে কবিরাছড়া লিখে, ছবি বই ছাপিয়ে দশজনকে জানাতেন। বন্যা-ঝড় প্রভৃতি দুর্যোগের কথা ছড়ায় লেখা হতো। বাংলা ১৩৩৬ সালে ছাপা হয়েছিলঃ ‘নিদাণজলের কবিতা’। কবি ওপ্রকাশকের নাম ঃ সেখ কারী আবদুল ওয়াহিদ। বইটি ইসলামিয়া প্রেস, শ্রীহট্ট থেকে ছাপা হয়েছিল। দাম দশপয়সা। কিছু অংশ হলো এই ঃ

‘সন ১৩শত ২ হইলগত
ছয়ত্রিশবাঙ্গালার।

প্রথম বৈশাখ মাস রোজ রবিবার ।।
বৃষ্টি শু হইল ২ ঘোর কইল
তামামী-সংসার।
রাত বরাবর কইলদিনেতে আন্ধার ।।'

বাংলা১৩২৯ সালে কলকাতা থেকে ছাপা হয়েছিল —'বন্যাকাহিনী'। এই ছড়ার কবির নাম — মহাম্মদখয়েরালী। কবিলিখেছেন ঃ

কী রূপে ভীষণ বন্যাআসি এই দেশে।
লোকের জিনিসপত্র নিয়ে গেল ভেসে ।।
শত শত নরনারী ডুবেগেল জলে।
গো-মহিষ ছাগ মেষ ভেসেগেল চলে ।।'

হেটোছড়ায় ঃ জার্মেনি পনা

হেটো কবি কচুরি পানা(বেগুনীফুল বিশিষ্ট জলজ উদ্ভিদ বিশেষ) প্রসঙ্গে লিখেছেন,পানা বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। নদী,নালা, ঝিল ও পুষ্করিণীতে দেখা যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। নদী,নালা, ঝিল ও পুষ্করিণীতে দেখা যায়।
বাংলা ১৩২৯ সালে মুনসী ইরফান আলি লিখেছেন ঃ 'জার্মেনি পেনার কবিতা'।

কবি লিখেছেন ঃ

'কি অচরিত যে ২ভাই কবে নাহি শুনি।
কথা হইতে আসিল দাণজারমণি ।।
....
কথায় জন্ম সেইমর্ম্ম কিছু নাহি জানি।
সাতাইশ বাংলায় কিছু লোক মুখে শুনি ।।
আটাইস উনত্রিশ সালেরকথা শুন ভাই।
হাওয়ে না চলে নৌকাদড়া মিলে নাই ।।

সেকালের বন্যার ছড়া এবং ছড়াকার

প্লাবন প্রসঙ্গে সুপ্রসন্নবন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ 'বাংলাদেশে বন্যা সম্মন্ধে একাধিক ছোট-বড় ছড়া রচিত হইয়াছিল। একই বিষয় অবলম্বনে একাধিক রচনা বাংলাকাব্য-সাহিত্যের এক ট্রাডিশন। পশ্চিমবাংলার দামোদর নদের বন্যা লইয়াই একাধিক ছড়া রচিত হইয়াছিল। এই সকল ছড়া রচয়িতার মধ্যে নফর দাস,চণ্ডীচরণ, দ্বিজলাল মোহন, নরসিংহ দাস দ্বিজরাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ময়ুরাক্ষীর বন্যা অবলম্বনে একমাত্র দ্বিজ দ্বারকানাথ একটি ছড়ারচনা করেন।
দামোদরের বন্যা সম্পর্কেউল্লিখিত ছড়াগুলির বর্ণনভঙ্গী প্রায়শঃই একরূ প, এমনকিঅনেকস্থলে যে কোন কারণেই হউকএকের রচনাংশ অন্যের রচনাশ্রিত হইয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশের ছড়াই ১২০৩সালের বন্যা অবলম্বনে রচিত হয়।....

উক্ত গ্রন্থে লেখক আরও উল্লেখকরেন, 'অবিশ্রাম বর্ষণের ফলে আশ্বিন মাসে দামোদরে প্রায়ই দেখাদিত বন্যা।....

উক্ত গ্রন্থে একটি ছড়া উল্লেখকরা হয়েছে ঃ

'বাণ দেখি লোক সবহাহাকার ছাড়ে।
প্রাণ লঞাপালায় সব পথুরের পাড়ে ।।
সাযুড়ি জামাই ভাগিনবউ কিছুই না মানে ।
গাছে উঠে সাযুড়িরহাত ধরি টানে ।।'

হোলবোল গানে জল প্রসঙ্গ ঃ

‘আহা পাঁচবাড়ির পাঁচ নারী বৈকালেতে জোটে,
কলসী লয়ে আমোদ করেযাচ্ছে জলের ঘাটে।
জলের ঘাটে গিয়ে বলে শোনলো ঠাকুরঝি
কালকেকারের ভাসান আমি দুটো শিখেছি ।।

(নদীয়া)

মন্দিরেরচাতালে জল ঢালা ঃ

অনাবৃষ্টির সময়গ্রামবাসীরা গ্রামদেবী ঝগড়া ভঞ্জনীর
মন্দিরের চাতালে জলঢালেন । (বাঁকুড়া)

বর্ধমানের লোকনাট্য লেটোগানে বন্যার কথা ঃ

‘এপার নদী ওপারনদী
মাঝখানেচর।
সেই চরেতে বাঁধবো মোরা
একটি ছোটঘর।।

বন্যা হলে সাঁতার কেটে
মোরাএকটি পাড়ে উঠবো।
ঘরের দিকে ফিরে না দেখে
মোরা একসাথে ছুটবো ।।’

বাংলা প্রবাদ এবং গ্রামবাংলারঅনেক ছড়ায় পাওয়া যায় নদ-নদী প্রসঙ্গ। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। পদ্মার ধারে বাস।
ভাবনা বারো মাস।।

২। নদীর মুখে বালির বাঁধ(অবাস্তব উপায়)
৩। ডুবে ডুবে জলখাওয়া (কপটসাধুতা)।
৪। ডুবমারা (লুকাইয়া থাকা) ।
৫। নালা কেটে কুমীর আনা (নিজেরবুদ্ধির দোষে বিপদ্ ডেকে আনা)।
৬। ফল্গুনদীঅন্তঃশীলে (যে মানুষ বাহিরে দেখিতে শান্তশিষ্ট অথচভিতরে কুটিল প্রকৃতির, তাহার সম্বন্ধেএইরূপ বলা হয়)
৭। বড় বড় হাতি গেল তল, মশাবলে দেখি কত জল(গুণী ও যোগ্য লোক যে কাজ করিতে অক্ষম, অযোগ্যলোকের সেই কাজ করিবার হাস্যকর প্র্যাস)।
৮। বেনোজল ঢুকিয়ে ঘরো জল বের করা (বাহিরের জিনিস ঘরে আনিয়া তাহার সঙ্গে ঘরের সজ্জিত বস্তুপর্যন্ত নষ্ট করা)।
৯। ভরাডুবির মুষ্টিলাভ (সর্বস্বহারাইবার কালে যৎসামান্য লাভ) ।
১০। ভালো কথা পড়ল মনেআঁচাতে আঁচাতে, ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে । (স্নানের ঘাটে ননদকে কুমীরে লইয়াযাওয়ার দুর্ঘটনা সম্বন্ধেশাশুড়ীর কাছে বউ এর সংবাদ জ্ঞাপন)।
১১। মন চাঙ্গা তো কটোরামেগঙ্গা (মনে যদি ভক্তি বিশ্বাস থাকে তবে কটোরাস্থ জলই গঙ্গা হইয়াদাঁড়ায়। পুণ্যবারির জন্য গঙ্গায় যাইবার প্রয়োজন হয় না)।

১২। মরা চাঙ্গা কুমীরে ভরা (নির্গুণ ওদরিদ্র ব্যক্তির মন হিংসাবিদ্বেষ পূর্ণ হইলে এইরূপ বলা হয়)।

১৩। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা (গঙ্গারই জলে গঙ্গাপূজার মতো)।

১৪। গঙ্গা প্রাপ্তি, গঙ্গালাভ(মৃত্যু)।

১৫। বিদ্যায় মা গঙ্গা (গঙ্গানদীর তুল্য গভীরও বিস্তৃত যাহার বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যা বলিতে যাহার কিছুই নাই)।

১৬। মা গঙ্গাই জানেন (আর কেহ জানে না বাবিশ্বাস করে না)।

১৭। শিশুদের খেলার ছড়ায় দামোদরের বন্যারকথা আজও শোনা যায়ঃ

‘ইকড়ি মিকড়ি,
চাম চিকড়ি,
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এলো দামোদার।।’

১৮। বাঁকুড়া জেলায়ময়নাপুরের মন্দিরের স্থানীয় নাম ‘হাকন্দ মন্দির’। হাকন্দ মন্দির পাথর দিয়ে গড়া । পাশে একটি দীঘি। দীঘির নাম ‘হাকন্দ’ দীঘি। গ্রামের অনেকের মা ছেলেকেআদর করে ছড়া কাটেনঃ

‘আমার ছেলে মাঠে বসে মাখেলালমাটি/হাকন্দ জলে মুছিয়ে দেব হবে সোনা খাঁটি’।

হেটোছড়ায় লোকশিক্ষা এবং দীঘি-নদী ঃ

একটি হেটো ছড়ায়‘লোকশিক্ষা’ প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল । ছড়ায় উল্লেখ করাহয়েছিল ঃ ‘মাটি বন দীঘি নদী আকাশ বাতাস।’

ছড়ার কিছু অংশ হল এই ঃ-

‘এই সব শিক্ষা ভাই আর কাজ নাই।
লোক শিক্ষা চাই মোরা লোকশিক্ষা চাই।।
মাটি বন দীঘি নদী আকাশ বাতাস।
প্রকৃতিরপাঠশালা গাছ পাতা ঘাস।।
সব কিছু জানা চাই অন্নযেন জোটে।
প্রতিঘরে হাসিমুখে কথা যেন ফোটে।
গ মোষ মুর্গি হাঁসনিয়ে ছাগ ভেড়া।
বাঁশবনে কেটে বাঁশ দাওঘরে বেড়া।।
পশু পক্ষী দেখাশোনা জানা সোজা নয়।
বহু কষ্টে বহুদিনে এরশিক্ষা হয়।
এই সব জানা হলো লোকশিক্ষানাম।
কিন্তু হায় পোড়া দেশনেই কোন দাম।।’

আরএকটি হেটো ছড়ায় বলা হয়েছিলঃ

‘দাতা আছেপ্রাণ আছে এই কলিকাতা।
হেথা আছে ভাগীরথী নদীগঙ্গামাতা।।’

তিস্তানদী এবং উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবী ‘তিস্তাবুড়ি’ঃ

নদীকে জীবনদায়িনী দেবীরূপে অনেকজায়গায় পূজা করা হয়। যেমন গঙ্গা।হাওড়া জেলায় কয়েকটি গ্রামে এবং শহরএলাকায় মকরবাহনা গঙ্গার মাটির মূর্তি গড়ে পূজা করতে দেখা যায়। গঙ্গা মূর্তি দেখেছি জলপাইগুড়িরমন্থনী গ্রামের হাটতলায় একটি মন্দিরে। ওই মূর্তি নিত্যপূজার কথা শুনেছিলাম।

ঢাকা শহরে(বর্তমানেবাংলাদেশ) অনেকে বিশেষ দিনে বুড়িগঙ্গার উদ্দেশ্যে পূজা দিতেন। নদীর জলে ফুল নিবেদন করতেন। ময়মনসিংহ শহরে (বর্তমানে বাংলাদেশ) অশোকাষ্টমীর দিনে ব্রহ্মপুত্র-নদেরউদ্দেশ্যে ধর্মপ্রাণ নর-নারী পূজা দিতেন। ওই দিন নদীর ধারে মেয়েদের ভিড় বেশি হতো।

উত্তরবঙ্গে বহু নদী। যেমন ঃ তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, রায়ডাক,কালজানি, মহানন্দা এবংমেছিনদী। এইসব হলো পার্বত্য নদী। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে নদী ভীষণ আকারধারণ করে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে তিস্ত ানদীকে'তিস্তাবুড়ি' দেবীরূপে পূজা করা হয়। তিস্তার আর এক নাম ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ির মন্থনী গ্রামে বসে শুনেছিল াম, তিস্তাবুড়িরকথা। জলপাইগুড়ির প্রায়সকল সম্প্রদায় তিস্তাবুড়ির পূজা করেন। বিশেষ করে রাজবংশীদের কাছে এই নদী গঙ্গার মতো অতি পবিত্র।

দেশের বিভিন্ন স্থানেরকৃষিজীবীগণ বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করে থাকে। তা'ছাড়া, নদীর জলধারার ওপর নির্ভরকরতে হয়। যে কোন নদীর দু-পাশেরকৃষিজীবী নর-নারী নদীর জয়গান গেয়ে থাকেন। নদীকে নিয়ে কিংবদন্তী, গ ান, ছড়া ঘুরতে থাকে কৃষিজীবীমানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে। উত্তরবঙ্গে শোনাযায় তিস্তাবুড়ির কথা। তিস্তা পবিত্র নদী। তিস্তা কৃষিজীবীদের আপনজন। তা ছাড়া যারাব্যবসায়ী,নৌকা করে নানা পণ্য নিয়ে এ-হাট থেকে আর এক গঞ্জে নিয়ে যায়তার াও তিস্তাবুড়িকে পূজা দিয়ে তারপর নৌকাতে পণ্য ওঠাবারব্যবস্থা করেন।

উত্তরবঙ্গে বৈশাখ মাসেতিস্তাবুড়ির পূজা হয়। সাধারণত মেয়েরা পূজায় অংশ গ্রহণ করেন। পূজা হয় ঘট, কলসি অথবা একটি বাঁশেরডালায়। গ্রামে অথবা বাড়িতে পরপরকয়েকজন অসুস্থ হলে, তিস্তাবুড়ির উদ্দেশে অনেকে ম ানত করেন। রোগ সেরে গেলে, সুবিধা মতো যেকোনমাসে ভক্তরা তিস্তাবুড়ির পূজা করেন। তিস্তাবুড়িকে কল্পনা করা হয় বৃদ্ধারূপে। তিনি যেন এক হাতে একটি লাঠিতে ভরদিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর একটি হাত থাকে তাঁর কোমরে। জলপ াইগুড়ির গয়ারকাটা অঞ্চলেশুনেছিলাম, জনৈক ব্যক্তির গ্রামের বাড়িতে ওই রূপ কল্পনা করে মাটিরএকটি ছোট মূর্ত্তি গড়ে পূজা করেন। জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের বিভিন্ন গ্রামে এই পূজা যাঁরাকরেন তাঁদের বলা হয় —'দেওধা' বা 'দ্যেমধা'। নৈবেদ্য কলার পাতায় সাজানো হয়। তিস্তাবুড়িকে নিবেদন করা হয় ঃ আতপচাল, মুড়ি মুড়কি, নারকেল, ন াড়ু,সুপারি, পান, গুড়, পাকাকলা, দুধ দই ঘি মধু ইত্যাদি। অনেকে হংসের ডিম নৈবেদ্যে দিয়ে থাকেন বলেশুনেছিলাম। অনেক সময় সাদা পায়রা বলি দ্যেয়া হয়। পূজা হয় দিনের বেলায়।'দেওধা' তিস্তাবুড়ির উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়েন ঃ

'ধরতি আসন, ধরতি বসন
এই ধরতি বসে যাবো
তিস্ শালগুড়িদেবাগণ'—ইত্যাদি

জলপাইগুড়ির রাজবংশীসম্প্রদায়ের বহু গ্রামের মেয়েরা দল বেঁধে তিস্তাবুড়ির গান গায়। একজনের হাতে থ াকে বাঁশের তৈরি ডালা। আর একজনের হাতে থাকে ছাতি। তিনি ডালাটির ওপর ছাতি ধরে থাকেন। সাধারণত যিনি ছ াতি ধরেন তিনি বয়সেবড় বা বৃদ্ধা। তাকে বলা হয়'মরোয়ানী'। গ্রামে বাড়িবাড়ি ঘুরে সকলের সাহায্য নিয়ে নদীর ধারে পূজা করা হয়।

পূজার সময় মেয়েরা গান ধরেন ঃ

'আসিলেন মাওতিস্তাবুড়ি
দুয়ারে দিলেন পাও,
তোর লাগি পূজাকরি'—ইত্যাদি

ডক্টর চাচন্দ্র সান্যাল মহাশয়লিখিত ' The Rajbansis of North Bengal গ্রন্থে উল্লেখ আছে 'তিস্তাবুড়িরগ ান।' এখানে একটি গান উল্লেখ করা হলো ঃ

'নাহি জল নাহি থল নাহি তারি আকাশ
এইছিরি মণ্ডব না হয় ছিরিকো বিলাস
বাঁওহাতে চাম্পাকেলা ডাহিনে শাংক বিলাস
তাহারউপর আসন কৈল ধর্ম নিরঞ্জন

পূবেনা বন্দিব পীর পাকাম্বর
দক্ষিণেবন্দিব মা কালীর চরণ
পশ্চিমেবন্দিব সমুদ্র সাগর
উত্তরেবন্দিব পান্‌চ বাহিনী বুড়ি
আকাশেপন্নাম করি আকাশের কামিনী
পাতালেপন্নাম করি পাতাল বাসুকী
শূন্যেরমধ্যে পন্নাম করি বুড়া বুড়ি
পাটেরমধ্যে পন্নাম করি মহাময়ী তিস্তাবুড়ি।'

সারা উত্তরবঙ্গে রয়েছেতিস্তাবুড়ির অসংখ্য ভক্ত। তাঁরা ভক্তি বিশ্বাস ও এক অজানা শক্তির আশায়এই লৌকিক দেবীর পূজা করেন। দেবীকে সন্তুষ্ট করতে গ্রামের মেয়েরা গান গায়। ওই গান ভেসে বেড়ায় উত্তরবঙ্গের খরস্রোতানদীর দুই কূল ধরে। গান ভেসে বেড়ায় ধান ও পাটখেতের আশে-পাশেরগ্রামগুলিতে।

পরিশেষ অংশে এই কথা উল্লেখকরতে চাই হেটো বই -হেটো ছড়া, সঙের গান, সঙের ছড়া,গ্রাম বাংলারবিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে পল্লী কবিদের দ্বারা রচিত ছড়া ও গান থেকে সমাজচিত্র এবং ইতিহাস লেখার উপাদানসংগ্রহ করা যায়।এক সময় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেশ কিছু গান সংগ্রহকরেছিলাম।ওই সব ছড়াগান লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি প্রবাহ।সাধারণ মানুষের ঐতিহ্যের ধারাকে আশ্রয় করেলোক সংস্কৃতি প্রাণময়। হেটোবই- হেটোছড়া প্রভৃতিলোকসাহিত্যের একটি ধারা রূপে গণ্য করা হয়।

সূত্রনির্দেশ

১সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর সংস্কৃতি
২শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত
৩দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ
৪সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা
৫অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম
৬ গুপদ দাস বাবাজী, শ্রী শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য
৭ চারুচন্দ্র সান্যাল, The Rajbansis of North Bengal
৮ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, তুষুব্রত ওগীতি সমীক্ষা
৯ সুনীতি কুমার মুখোপাধ্যায়, মেলা ওউৎসবের দর্পণে বাংলা লোক সাহিত্য
১০ প্রেমেন্দ্র মজুমদার—সম্পাদক,লৌকিক উদ্যান বিশেষ লোকসংগীত সংখ্যা, শরৎ ১৪০৫,
১১ বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, বাংলাদেশের সঙপ্রসঙ্গে
১২ ঐ, পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে লোকসংস্কৃতি
১৩ ঐ পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেব-দেবী ও লোকবিশ্বাস
১৪ঐ হেটো বই-হেটো ছড়া
১৫ঐ কলকাতা প্রসঙ্গে ছড়া-গান-কবিতা।

লেখকপরিচিতি— প্রবীণ স্বাধীনতাসংগ্রামী, লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ে নানাবিধ গ্রন্থ প্রণেতা। 'গণশক্তি' প্রত্রিকার সঙ্গেযুক্ত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com